প্রথম আলো

কলাম

মতামত

শিক্ষা আইন: তাড়াহুড়োর আইন, নাকি আরেকটি সুযোগ হারানো?

লেখা: মোস্তাফিজুর রহমান

প্রকাশ: ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২২: ০১

বাংলাদেশে একটি সমন্বিত শিক্ষা আইনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা চলছে দেড় দশকের বেশি সময় ধরে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ যে দৃষ্টিভঙ্গি ও দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল, তার আলোকে ২০১১ সাল থেকেই শিক্ষা আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এরপর একাধিকবার খসড়া তৈরি হয়েছে, মন্ত্রিপরিষদে গেছে, আবার অদৃশ্য নানা কারণে ফিরে এসেছে। এত দীর্ঘ সময়েও আইনটি পাস না হওয়ার পেছনে প্রশাসনিক জটিলতার পাশাপাশি রাজনৈতিক দ্বিধা ও কিছু বিতর্কিত বিষয়ের ভূমিকা ছিল বলেই মনে হয়।

এ প্রেক্ষাপটে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার মেয়াদের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে হঠাৎই শিক্ষা আইন ২০২৬-এর খসড়া প্রকাশ করেছে এবং জনমত দেওয়ার জন্য অত্যন্ত সীমিত সময় রাখে। একটি শিক্ষা আইন শুধু প্রশাসনিক দলিল নয়; এটি একটি প্রজন্মের শেখার সুযোগ, রাষ্ট্রের মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তি নির্ধারণ করে। এ কারণে তাড়াহুড়ো করে, পর্যাপ্ত জাতীয় আলোচনা ও অংশীজনদের সম্পৃক্ততা ছাড়া এমন একটি আইন চূড়ান্ত করার উদ্যোগ মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

খসড়া শিক্ষা আইনে কিছু ইতিবাচক ভাষ্য থাকলেও গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এটি মূলত বিদ্যমান ব্যবস্থাকেই আইনি কাঠামোর মধ্যে এনে সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষা সংস্কারের জন্য যে রূপান্তরমূলক দৃষ্টিভঙ্গি দরকার, তার প্রতিফলন এখানে দুর্বল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্রাথমিক শিক্ষাকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক রাখার বিষয়টি।

বাস্তবে এটি নতুন কিছু নয়; প্রায় সাড়ে তিন দশক ধরে এটি কার্যকর রয়েছে। অথচ জাতীয় শিক্ষানীতিতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের কথা বলা হয়েছে এবং শিক্ষাবিদ ও নাগরিক সমাজ দীর্ঘদিন ধরেই পুরো মাধ্যমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার দাবি জানিয়ে আসছে। খসড়া আইনে সেই অগ্রগতির কোনো প্রতিফলন না থাকা একধরনের নীতিগত পশ্চাৎপসরণ।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কোচিং, প্রাইভেট টিউশন ও নোট-গাইড বই বা সহায়ক পুস্তক। খসড়া আইনে বলা হয়েছে, আইন কার্যকর হওয়ার তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে এসব কার্যক্রম ধাপে ধাপে বন্ধের উদ্যোগ নেওয়া হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই সময়সীমা কেন? এত দীর্ঘ সময় ধরে যে কোচিংনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে, তার মূল কারণ শ্রেণিকক্ষের দুর্বলতা, পরীক্ষাকেন্দ্রিক মূল্যায়ন এবং শিক্ষকদের পেশাগত সক্ষমতা ও প্রণোদনার ঘাটতি। এসব কাঠামোগত সমস্যার সমাধান ছাড়া কেবল নিষেধাজ্ঞা দিয়ে কোচিং বন্ধ করা সম্ভব নয়। বরং এতে অনানুষ্ঠানিক ও অনিয়ন্ত্রিত বাজার আরও বিস্তৃত হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

একটি যুগোপযোগী ও ন্যায়ভিত্তিক শিক্ষাকাঠামো গড়ে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ ছিল শিক্ষা আইন ২০২৬। কিন্তু তাড়াহুড়ো, সীমিত পরামর্শ ও রূপান্তরমূলক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে এটি সেই সুযোগ হারানোর ঝুঁকিতে আছে। শিক্ষা আইন যেন আরেকটি প্রশাসনিক দলিল না হয়ে ওঠে। বরং তা হোক ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সামাজিক চুক্তি। সে জন্য সময় নিয়ে, সাহসী সংশোধনের মাধ্যমে এই আইনকে নতুন করে ভাবাই এখন সবচেয়ে জরুরি।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও পেশাগত উন্নয়নের বিষয়টিও খসড়া আইনে যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি। শিক্ষক প্রশিক্ষণকে একটি ধারাবাহিক ও মানসম্পন্ন প্রক্রিয়া হিসেবে গড়ে তোলা ছাড়া শ্রেণিকক্ষে গুণগত পরিবর্তন সম্ভব নয়। একই সঙ্গে

শিক্ষক নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও পেশাদারি নিশ্চিত করা জরুরি, যা আইনটিতে স্পষ্ট রোডম্যাপ হিসেবে অনুপস্থিত।

কওমি মাদ্রাসা প্রসঙ্গে খসড়া আইনে শিক্ষার মানোন্নয়নের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তা অপর্যাপ্ত। শিক্ষাব্যবস্থার শাসনকাঠামো নিয়েও গুরুতর নাগরিক উদ্বেগ রয়েছে। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিতে রাজনৈতিক দলের পদধারী ব্যক্তি কিংবা নির্বাচিত (রানিং) জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিরপেক্ষতা ও পেশাদারি ক্ষুণ্ন করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত না হলে সেখানে শিক্ষার পরিবেশ টেকসই হয় না। তাই আইনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন, এই ধরনের কোনো ব্যক্তি যেন ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনা কমিটির সদস্য হতে না পারেন।

অর্থনৈতিক দিক থেকেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন প্রয়োজন। টিউশন ফির ওপর কোনো ধরনের ভ্যাট বা অতিরিক্ত করারোপ শিক্ষাকে আরও ব্যয়বহুল করে তোলে এবং নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য বাধা সৃষ্টি করে। শিক্ষা একটি সামাজিক বিনিয়োগ; এখানে করমুক্ত সুবিধা নিশ্চিত করাই যুক্তিসংগত।

উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে খসড়া আইনে কিছু সাধারণ কথা থাকলেও একটি কার্যকর রিসার্চ-টু-পলিসি কাঠামোর কথা নেই। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার উন্নয়নের জন্য নিয়মিতভাবে অ্যাকশন রিসার্চ পরিচালনা করা এবং সেই গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে পাঠ্যক্রম, মূল্যায়ন ও শিক্ষণপদ্ধতির সংস্কার করা জরুরি। গবেষণা যদি শ্রেণিকক্ষ ও নীতিনির্ধারণের সঙ্গে সংযুক্ত না হয়, তবে তা কেবল কাগজেই সীমাবদ্ধ থাকে।

সবশেষে অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিকভাবে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ ছাড়া শিক্ষা আইন অর্থবহ হতে পারে না। দুর্গম ও পিছিয়ে পড়া এলাকায় শিক্ষক ধরে রাখার জন্য বিশেষ ভাতা, শিক্ষার্থীদের জন্য মিড-ডে মিল ও লক্ষ্যভিত্তিক উপবৃত্তি এবং মানসম্মত অবকাঠামো নিশ্চিত করা, এসব বিষয় আইনে সুস্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

সব মিলিয়ে বলা যায়, একটি যুগোপযোগী ও ন্যায়ভিত্তিক শিক্ষাকাঠামো গড়ে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ ছিল শিক্ষা আইন ২০২৬। কিন্তু তাড়াহুড়ো, সীমিত পরামর্শ ও রূপান্তরমূলক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে এটি সেই সুযোগ হারানোর ঝুঁকিতে আছে। শিক্ষা আইন যেন আরেকটি প্রশাসনিক দলিল না হয়ে ওঠে। বরং তা হোক ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সামাজিক চুক্তি। সে জন্য সময় নিয়ে, সাহসী সংশোধনের মাধ্যমে এই আইনকে নতুন করে ভাবাই এখন সবচেয়ে জরুরি।

- **মোস্তাফিজুর রহমান** শিক্ষাবিষয়ক গবেষক

*মতামত লেখকের নিজস্ব

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৬ প্রথম আলো